স্থাপিত - ১৯৯২

খেয়া

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯ রেজি নং S/73377 under WB Act XXVI of 1961

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি স্বপন রায় চৌধুরী '৫৩
সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় '৮৫
পত্রিকা সম্পাদক শান্তনু চট্টোপাধ্যায় '৮৩

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2020 • Vol 09 • Issue 07-08 • 15 August 2020 • Price Rs. 2.00 •

সম্পাদকীয়

দেখতে দেখতে প্রায় পাঁচ মাস কেটে গেল। সেই মার্চ মাসের শেষের দিকে শুরু হয়ে বিভিন্ন পর্বের মধ্য দিয়ে চলেছে এই সামজিক দূরত্ব বজায় রেখে লকডাউন জীবনযাত্রা। এই সময়ের মধ্যে আমরা বেশ কিছু নতুন, অপরিচিত ও অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহৃত শব্দের সঙ্গে একাত্ম হলাম। লকডাউন, কোয়ারান্টাইন, আইসোলেশন, অ্যান্টিবডি, স্যোশাল ডিসটেন্সিং, মাস্ক, ফেস গার্ড, স্যানিটাইজার ইত্যাদি। শুধু শব্দই নয়, এরা বাস্তবিক ক্ষেত্রে আমাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে গেছে। সারা পৃথিবী জুড়ে সমগ্র মানবজাতি আজ সার্বিক ভাবে একটা আতঙ্কের আবহ আর পরিবর্তিত জীবনধারার সঙ্গে মোকাবিলা করছে। করোনা ভাইরাস নামক এক প্রায় অজ্ঞাত ও অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে এই অসম লড়াই মানুষকে চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের যথেষ্ট অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও এই অতিমারীর প্রকোপ কিছুতেই প্রতিহত করা যাচ্ছে না। তবে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কিছুটা হলেও এই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। সচেতনতা কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে, সাবধানতা অবলম্বন করতেও শিখেছি আর কিছুটা অভ্যস্ত হয়েছি। এর ফলে আতঙ্কের পরিমাণ কিছুটা হলেও কমেছে। যদিও সংক্রমণের হার আমাদের দেশে এখনও কমেনি, শতাংশের হার কম হলেও মৃত্যু হচ্ছে। বর্ষা শেষে শরতের আগমনী আমাদের বাঙালির মনে যে আনন্দের দোলা দিয়ে যায় এ বছর তা অনুপস্থিত। বরং একদিকে রোগ ও মৃত্যুর ভয় আর অন্যদিকে সামগ্রিক ভাবে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, এই দুই বিপদের কারণে চারিদিকে শোনা যাচ্ছে মানুষের হাহাকার। ছোটোখাটো ও মাঝারি ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অসংখ্য মানুষ চাকরি হারাচ্ছে, স্কুল কলেজ ও অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ, প্রচুর মানুষের রোজগার বন্ধ অথবা কমে গেছে। জীবন রক্ষা করতে গিয়ে জীবিকা হারাচ্ছে মানুষ আর অনেকেই জীবিকার তাগিদে জীবনকে বাজি রেখে কোনওক্রমে টিঁকে রয়েছে। এরই মধ্যে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের সীমিত ক্ষমতা অনুযায়ী আমরা আমাদের দায়িত্ব যতদূর সম্ভব পালন করে চলেছি। স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের অভাবী ছাত্রদের পড়াশোনা নির্বিঘ্নে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের স্কুলের মাহিনা, বই-খাতা কেনা ইত্যাদির উদ্দেশ্যে অ্যাসোসিয়েশন স্কুলের হাতে তিন লক্ষ টাকার চেক তুলে দিতে পেরেছে। বিভিন্ন প্রাক্তনী সদস্যের সহৃদয় অনুদানের ফলেই জ্যোতিভূষণ চাকী ছাত্রবন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে এই ভাবে বর্তমান ছাত্রদের পাশে আমরা দাঁড়াতে পেরেছি। এর জন্য আমরা আনন্দিত। প্রাক্তনী সদস্যদের ধন্যবাদ। এ ছাড়াও বিভিন্ন বয়স্ক, অসহায় ও বিপন্ন প্রাক্তনীদের প্রয়োজনে লোকবল বা সামান্য অর্থবল দিয়ে তাদের যেটুকু সাহায্য অ্যাসোসিয়েশন করতে পেরেছে সেটা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। কিছু প্রাক্তনী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই সুস্থ হয়ে গেছেন আর দু একজনকে আমরা চিরতরে হারিয়েছি। তাদের পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা জানাই। আমাদের স্কুলের সদ্য পাশ করা ছাত্র অর্থের অভাবে কলেজে ভর্তি হতে পারছে না এবং পড়াশোনা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ কয়েকজন প্রাক্তনী সদস্য অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। অ্যাসোসিয়েশনের তরফে এটা আরেকটা আনন্দ সংবাদ। বর্তমানে ডাক বিভাগের সমস্যা চলছে। ডাকটিকিট পাওয়া যাচ্ছে না। সেই কারণে খেয়া-র গত সংখ্যাটি এখনও ডাক মারফত দদস্যদের কাছে পৌঁছয়নি। এই সংখ্যাটিও আপাতত অনলাইন সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হল। ডাক ব্যবস্থা স্বভাবিক হলেই আমরা পরপর খেয়া-র সংখ্যাগুলো সদস্যদের কাছে পৌঁছে দিতে পারব। এ বারের খেয়ায় দেবপ্রসন্ন সিংহ এবং দেবদীপ দে-র দুটি ধারাবাহিকের পরবর্তী অংশের পাশাপাশি আরও দুটি ধারাবাহিক চালু হল। দেবপ্রতিম ভট্টাচার্য লিখেছেন ভারতীয় রেলের বেসরকারিকরণ নিয়ে একটি বিশ্লেষণী নিবন্ধ এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের শতবর্ষের প্রেক্ষিতে সুকমল ঘোষের নিবেদন। বিভিন্ন বিষয়ে লেখা পাঠানোর জন্য আবারও সদস্যদের কাছে অনুরোধ রইল।

ছোঁয়া • Vol 09 • Issue 07-08 • 15 August 2020 RNI No. WBBEN/2010/32438 Regd.No.:KOL RMS/426/2020

করোনাজয়ীর কলমঃ সরকারি ব্যবস্থাপনাতেই দিব্যি ভালো হয়ে গেলাম

লকডাউন ও সতর্কতা — মার্চ মাসে লকডাউন শুরু হওয়া থেকে যা যা সতর্কতা ভাবা সম্ভব সবই নিয়েছি, এমনকী হাতের আংটিও খুলে রেখেছি, নিয়মিত বিভিন্ন কোভিড সংক্রান্ত ডাক্তারি পরামর্শ শুনে নিজেকে সেইভাবেই নিয়ন্ত্রণ করেছি। সংবাদপত্র, কাজের লোক, বাইরের খাবার সব বন্ধ। জুলাই পর্যন্ত খুব বেশি হলে বার দশেক রাস্তায় নেমেছি, আর আমার স্ত্রী বার চারেক। বাকি আর ৩ জন সদস্য বাড়িতেই থেকেছে।

শরীর খারাপ — জুন মাসের ১৮ তারিখে আমার বাড়ির ৭৫ বয়সী এক পুরুষ সদস্যের জ্বর আসে, প্রথম দুদিন দিনে একবার, তারপরে জ্বর আসার সময়ও কমে যায় ও দিনে দু-তিনবার আসতে থাকে। সঙ্গে কাশি বুকে সর্দি। ক্যালপল দিতাম।

ডাক্তারের পরামর্শ — ২২ জুন তারিখ স্থানীয় ডাক্তার দেখালাম, তিনি বুকের এক্স-রে ও কিছু ব্লাড টেস্ট দেন। সঙ্গে সঙ্গেই এক্স-রে হয়, দেখা যায় বুকে জল আছে। পরদিন ২৩ তারিখ ব্লাড টেস্ট হয়। ২৪ তারিখ পিয়ারলেস হাসপাতালে যাই চেস্ট স্পেশালিস্ট দেখাই, তিনি কোভিড টেস্ট করতে বলেন। টেস্ট করে বাড়ি চলে আসি। জ্বর এখন দিনে ৩ বার।

কোভিডের ছোবল — লোহার বাসর ঘরে থেকেও লখিন্দর রক্ষা পায়নি, উনিও পেলেন না, ২৪ জুন রাত ১০টা নাগাদ পিয়ারলেস থেকে ফোন করে জানানো হয় কোভিড পজিটিভ, whatsapp করে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেয় ও বলে যে ওয়েব সাইটে নাম চলে গেছে।

স্বাস্থ্যদপ্তরের তদারকি — ২৫ জুন সকাল ১০টা থেকে শুরু হয় ফোন আসা। স্বাস্থ্যদপ্তর, কর্পোরেশন, কাউন্সিলার, নোডাল অফিস ও আরও অনেক জায়গা থেকে, সব মনে নেই। যেহেতু ওনার অন্য কোনও সমস্যা ছিলনা আমরা ডাক্তারের পরামর্শে বাড়িতে রাখার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু স্বাস্থ্যদপ্তর হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য চাপ দেয়, শেষমেশ আমরা রাজি হই ও অনুরোধ করি মেডিকাল কলেজে ভর্তির জন্য, ওনারা মেনে নেন ও অ্যাম্বুলেন্স পাঠান।

হাসপাতাল যাত্রা — ১২.৩০ নাগাদ অ্যাম্বুলেন্স আসে, পিপিই কিট পরে দুজন ওনাকে নিয়ে যান। ওনারা দুপুর দুটো নাগাদ ফোনে জানান যে রোগী ভর্তি হয়ে গেছেন, ওয়ার্ডে ফোন করে বেড নাম্বার জেনে নিতে। আমরা ফোনে ওনার সঙ্গে কথা বলতে পারতাম।

চিকিৎসা ও পরিষেবা — এসি ওয়ার্ড, ঝাঁ চকচকে ঘর ও বেড, মাথার পিছনে চার্জারের পয়েন্ট ও ২৪ ঘণ্টা অক্সিজেন, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনার, ওষুধ ইঞ্জেকশন, ক্লিনিকাল টেস্ট, রক্ত সব ওরাই ব্যবস্থা করেছেন এবং সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। প্রথমদিকে উনি ভালই ছিলেন, পরে অক্সিজেনের মাত্রা কমতে থাকে ও অক্সিজেন চালু হয়। মাঝে দুদিন খুবই সিরিয়াস কন্ডিশন ছিল, ICCU তৈরি রেখেছিল, কিন্তু সম্ভবত হাই-ফ্লো অক্সিজেনেই আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে ওঠেন। মাঝে আবার পা পিছলে পড়ে গিয়ে মাথা ফাটে, সিটি স্ক্যান হয়। হিমোগ্লোবিন খুব কমে যায়, দু বোতল রক্ত দিতে হয়। তবে উনি কখনওই শ্বাসকষ্টে ভোগেননি। সব ব্যবস্থাই হাসপাতাল করেছে। দীর্ঘ ২৪ দিনের পর সুস্থ হয়ে উনি বাড়ি ফেরেন। ২০ দিন হয়ে গেল, কিছুটা দুর্বলতা ছাড়া উনি সম্পূর্ণ সুস্থ। আমরা দু-তিনবার হাসপাতালে গেছি, ডাক্তারের সঙ্গে একতলায় বাইরে থেকে কথা বলতে, তবে না গেলেও চলত। চিকিৎসা করাতে একটা টাকাও লাগেনি, আমার হিসাবে বেসরকারি হাসপাতালে ১০ লক্ষের বেশি বিল হত।

সরকারি ব্যবহার — ২৫ জুন সকালে প্রথম ফোন থেকে, অ্যাম্বুলেন্স চালক, স্বাস্থ্যদপ্তর, হাসপাতাল, কর্পোরেশন, নোডাল অফিস, লোকাল নেতা প্রচুর ফোন হয়েছে। নিয়মিত খোঁজখবর নিয়েছেন সবাই। আমরা হাসপাতালে ফোন করেও নিয়মিত কথা বলেছি, কোথাও কোনও বাজে বিরক্তিকর অসহযোগিতা বা ব্যবহার পাইনি, পুলিশ এসে বাঁশ দিয়ে বাড়ির সামনে আটকে দিয়ে যায়, ফোন নম্বর দেয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস বাজার ওষুধ ইত্যাদি এনে দেবে বলে, আমার প্রয়োজন হয়নি। আমি আপ্লুত।

বাকি সদস্যরা — আমরা যারা বাড়িতে ছিলাম ডাক্তারের পরামর্শে দিনে দুবার ভিটামিন সি খেতে শুরু করি, এখনও খাচ্ছি। উনি হাসপাতালে যাবার ৩-৪ দিন পর আমার ছেলের স্বাদ ও গন্ধ সম্পূর্ণ চলে যায়। ২৪ জুন তারিখেই রাতে আমার জ্বর আসে ১০০র উপর, পরের দিনও ৯৯ ছিল, আর আসেনি। ছেলের পরের দিন আমারও স্বাদ ও গন্ধ চলে যায়। বাড়ির বাকি দুজনের সামান্য জ্বর, গা ম্যাজম্যাজ কাশি ইত্যাদি ছিল। আমাদের স্বাদ ও গন্ধ দিনে সাতেক পর ফিরে আসে। বাকিদের কারও কোভিড টেস্ট হয়নি।

আমার বন্ধু ও প্রতিবেশীরা — আমার বন্ধুরা বেশ কয়েকবার বাজার ওষুধ ইত্যাদি কিনে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেছে। প্রতিবেশীরাও নিয়মিত খোঁজ নিত। উদ্বেগ ছাড়া আর কোনও অসুবিধায় পড়তে হয়নি। উনি ২৪ দিন যে ওয়ার্ডে ভর্তি ছিলেন সেখানে ৩২ টি বেড ছিল। ২৪ দিনে বহু রোগী এসেছে সুস্থ হয়ে গেছে, কাউকে মারা যেতে দেখেননি।

প্রতিম দে

ঐতিহ্য দেবপ্রসন্ন সিংহ

২০২০ সালে স্কুল পেরোনোর ১০৬ বছরে, কত ছাত্র কখনও বিশেষ পরীক্ষায়, কখনও খেলাধূলায় বা সাংস্কৃতিক কর্মে তাদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তারপরেও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমরা কৃতিত্বের অধিকারী ছাত্রদের নিয়ে প্রায়শই গর্ববোধ করি, জানতে ও জানাতে চাই তাদের কথা নব প্রজন্মের কাছে, আরো বেশি করে। সে তালিকা দীর্ঘ, জীবনীতথ্যের চুম্বকটুকু জেনেও। এই ভূমিকার প্রয়োজন এইখানেই, যখন কৃতীদের মধ্যে আমার জানাশোনা শিক্ষাবিদদের নাম দিয়ে প্রথমত শুরু করছি। কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুলের শিক্ষকদের বেশ কিছু নাম, কয়েকজন নামী সাহিত্যিক, গীতিকারের নামও। আপাতত প্রথম ষাট বছর, ১৯৭৪ পর্যন্ত ছাত্রদের নাম আর ন্যূনতম তথ্য দিয়ে এর শুরু। কিছু কিছু জায়গায় তা প্রকাশিত। তবু স্বাভাবিক কারণেই, এ তালিকা সম্পূর্ণ হতে পারে না । আমরা সেই সংযোজনের অপেক্ষায় থাকব। আমরা এইখানে এই লেখায় পেশ করা তথ্যের পরেও আরও বাড়তি তথ্যর জন্যও সকলের কাছে এক নিবেদন রাখছি।
শুরু করা যাক ১৯২১ সাল থেকে। হরিসাধন ঘোষ এই বছর পাশ করে আমাদের স্কুলেই তিরিশ বছরের বেশি বাংলার শিক্ষক ছিলেন। ১৯২২ সালে একজনের কথা আগের সংখ্যায় জানিয়েছি। তিনি হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য। আইসিএস, বহু গ্রন্থের প্রণেতা। ঐ বছর আরেক জন শুভেন্দু শেখর বসু, স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম ছাত্র হিসেবে স্কলারশিপ পান । পদার্থবিদ্যায় এম এসসি - প্রথম। পরে রাশিবিজ্ঞানে - কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে , আই এস আই তে গবেষণা, অধ্যাপনা। ১৯২৭ সালে দুই নামী সাহিত্যিককে পাই - গজেন্দ্র কুমার মিত্র ও সুমথনাথ ঘোষ। অসংখ্য গ্রন্থের প্রণেতা, দুজনে 'মিত্র ও ঘোষ'এর প্রতিষ্ঠাতা, আত্মীয়ও বটে। সুশীল রায় কিছুদিন বাংলায় অধ্যাপনার পর 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার সহসম্পাদক, সম্পাদক হন। 'ধ্রুপদী' মাসিক কবিতা পত্রিকার সম্পাদকও। ১৯৩২ সালের ছাত্র পূর্ণেন্দু কুমার বসু ফলিত গণিতে এম এসসি। দাদা শুভেন্দু শেখরের বিষয়ে গবেষণা ও অধ্যাপনা শুরু করেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাশিবিজ্ঞানের অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান। মাঝে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহউপাচার্য ছিলেন। এর পরে নাম করব, ১৯৩৫ সাল থেকে স্কুল থেকে প্রথম হন নির্মল কুমার রায়। অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি। অর্থনীতিতে এম এ। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে অবসর নেওয়ার পর অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। এই রকম ভাবে কেউ আগে স্কুলে কাজ করে ব্যাংকে বা অবসরের পর পড়ানোয় যান বা বিভিন্ন সময়ে, লেখক তা নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানেন। ১৯৩৫ সালেই ষষ্ঠ স্থানাধিকারী মধূসূদন চক্রবর্তী বঙ্গবাসী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক হন। ১৯৩৬ সালে সদ্য প্রয়াত প্রায় একশ-ছুই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ আধিকারিক হিসেবে, অধ্যাপনায় নয়, কাজ করেছেন। তিনি জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত অসংখ্য কবিতা লিখে গেছেন। ১৯৩৮ সালের গিরিজাভূষণ মিত্র আই আই টি খড়গপুরের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। ঐ বছরই ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূগোলের অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন কর, পরে ডি পি আই হন।
১৯৪১ সালে আনন্দমোহন ঘোষ, বোস ইনসটিটিউটে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় অধ্যাপনায়। বহু সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অরুণকুমার দে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল ইন্জিনিয়ারিং পাশ কর CMERI, পরে আই আই টি পাওয়াই বোম্বের ডাইরেক্টর। অহিভূষণ দাশগুপ্ত বহু দশক আমাদের স্কুলের বাংলার শিক্ষক ছিলেন। ১৯৪২ সালে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। ১৯৪৩ সালে দেবপ্রসাদ সিংহ অর্থনীতিতে কাকদ্বীপ কলেজে পড়িয়েছিলেন, ব্যাংকে কাজ করার পর। আমাদের স্কুলে কিছুকাল পড়েছেন, পুরোটা নয়, তাদের মধ্যে তপন রায়চৌধুরী রয়েছেন, ঐতিহাসিক, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার স্বনামধন্য গীতিকার - শতসহস্র গান রচনা ছাড়াও অন্য রচনা রয়েছে। অনেক পরে নাম পাই অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের। বিশ্বভারতীর বাংলার অধ্যাপক, পরে পত্রিকার সম্পাদক। ১৯৪৫ সালে পাই কেশবচন্দ্র দত্ত, যিনি ফলিত গণিতে এম এসসির পর আই এস আইতে বিভিন্ন পদে ছিলেন এন এস এস ও, জড়িত শিক্ষণে। ১৯৪৬ সালে ভবরঞ্জন সেনগুপ্ত মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক, নামী ডাক্তার, বহু সমিতির সঙ্গে যুক্ত। ঐ বছরেই ছিলেন অশোক রুদ্র। স্বদেশে ও বিদেশে রাশিবিজ্ঞান নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা। আই এস আই ও পরে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক। বিবিধ বিষয়ে অজস্র লেখা, এমন কি অধীত অর্থনীতি বিষয়েও। শচীন্দ্রনাথ মিত্র বঙ্গবাসী কলেজে রসায়নবিদ্যা বিভাগে ছিলেন। রামেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজে শারীরতত্ত্ব বিভাগে। ১৯৪৭ সালের মিহিরকুমার রায় ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক, অন্যজন অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্কিটেকচার বিভাগের অধ্যাপক।

(চলবে)

খেয়া • Vol 09 • Issue 07-08 • 15 August 2020 RNI No. WBBEN/2010/32438 Regd.No.:KOL RMS/426/2020

ভারতীয় রেলের বেসরকারিকরণ – প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দেবপ্রতিম ভট্টাচার্য

প্রথমে যে প্রশ্নটা আমাদের মনে জেগে ওঠা খুব স্বাভাবিক সেটা হল রেল বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্তে এত প্রতিক্রিয়া বা হৈ চৈ কেন যেখানে আমরা আমাদের জন্ম ইস্তক এই দেশে সড়ক পরিবহণের প্রত্যক্ষ বেসরকারিকরণ এবং সাম্প্রতিক অতীতে বিমান পরিবহণের বেসরকারিকরণ এর অভিজ্ঞতা লাভ করেছি এবং শহুরে মধ্যবিত্ত মানসিকতায় তাতে আমার ব্যক্তিগত লাভের অঙ্ককে বৃদ্ধি পেতেই দেখেছি, হ্রাস পেতে নয়? আজকের দিনে দাঁড়িয়েও আমরা বিমানের টিকিট কিনতে গেলে সরকারি বিমান সংস্থা, যেমন এয়ার ইন্ডিয়ার টিকিটের আগে পরীক্ষা করে নিই বেসরকারি বিমান সংস্থার টিকিটের মূল্য কারণ তা সরকারি মূল্যের থেকে কম দামেও পাওয়া যায় বা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একই কথা প্রযোজ্য বেসরকারি সড়ক পরিবহণের ক্ষেত্রেও। অর্থনীতির একটি ধারার নাম রেল-সড়ক অর্থনীতি বা রেল-রোড ইকোনোমিক্স, যেখানে একটা ধারণা আছে যে দেশীয় অর্থনীতিকে যদি একটা মানবদেহ বলে কল্পনা করা হয় তবে রেল ও সড়ক পরিবহণ একত্রে সেই মানবদেহের ফিমার বোন যা ভেঙে গেলে সমগ্র অর্থনীতি শুধু ভেঙেই পড়ে না এগিয়ে চলার শক্তিও হারিয়ে ফেলে। বিমান পরিবহণ এই আলোচনা থেকে এই কারণেই সরে যেতে বাধ্য হবে যে তার উপভোক্তারা সমাজের একটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক বলয়ের মধ্যেই বাস করে। প্রান্তিক সমাজের কাছে তা কখনোই গ্রহণযোগ্য বিকল্প হয়ে উঠতে পারে না। এক্ষেত্রে সবার আগে গ্রহণযোগ্য বিকল্প হিসেবে রেলের নামই আসবে পিছনে সড়ক পরিবহণ। তাই রেলের বেসরকারিকরণ এর প্রভাব শুধুমাত্র দ্বি-মাত্রিক (টু-ডাইমেনশনাল) নয়, এটা বহুমাত্রিক বা মাল্টি ডাইমেনশনাল।

আমাদের দেশে রেলের বেসরকারিকরণের প্রভাব কিভাবে বহুমাত্রিক হবে সেটা নিয়ে আলোচনায় যাওয়ার আগে কয়েকটি মূলগত বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখের দাবি রাখে। আমাদের দেশে সরকার বাহাদুর (এক্ষেত্রে পূর্বতন কংগ্রেস সরকার এবং বর্তমান বিজেপি সরকার উভয়েরই সুর অভিন্ন) অর্থনীতির জনপ্রিয় একটি উক্তি ব্যবহার করে থাকেন (অবশ্যই নির্বাচনে জয়লাভ করে গদিতে আসীন হওয়ার পরে, নির্বাচনী ইস্তাহার বা নির্বাচন পূর্ববর্তী প্রতিশ্রুতির প্রচারে কদাপি নয়) আর তা হল "ব্যবসা করা সরকারের কাজ নয়"....এই উক্তিটি সার্বিকভাবে খুবই সত্য----ব্যবসা করা কখনওই সরকারের লক্ষ্য হতে পারে না (বিশেষত আমাদের মতো তথাকথিত গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো সম্পন্ন দেশে) কারণ ব্যবসা করার এক এবং একমাত্র লক্ষ্য হলো মুনাফা অর্জন এবং তার ক্রমান্বয় বৃদ্ধি। তাই যেহেতু সরকারের লক্ষ্য মুনাফার বৃদ্ধি নয় তাই ব্যবসা করা সরকারের লক্ষ্য হতে পারে না। এই পর্যায় অবধি কারওরই আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু সমস্যাটা হল অন্য জায়গায়। .তাহলে সরকারের কাজ কী? বিশ্বের বৃহত্তম সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহ্যগত ধারক ও বাহক এই দুই দলেরই সর্বাধিনায়করা এই বিষয়ে এক অদ্ভুত চিরন্তন নীরবতা সম্পূর্ণ সচেতনতার সঙ্গে বজায় রেখেছেন বরাবর। যে আচরণ অর্ধসত্য ভাষণের দোষে তাঁদের দুষ্ট করে, অর্ধসত্য মিথ্যার চেয়েও ভয়ংকর। বিশ্বের তাবড় অর্থনীতিবিদরা যেমন একথা স্বীকার করেন যে ব্যবসা করা সরকারের কাজ নয়, তেমনই একথাও জানাতে ভোলেন না যে গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোতে সরকারের প্রধান লক্ষ্য সামাজিক কল্যাণকামিতায় দেশের দরিদ্রতম প্রান্তিক মানুষটির কাছেও বিকাশের আলো পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনে উৎপাদন, বিতরণ এবং বাজারজাতকরণের সম্পূর্ণ মুনাফা বর্জিত (প্রয়োজনে ভর্তুকিযুক্ত) রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং তার প্রতি রাষ্ট্রের ধারাবাহিক দায়বদ্ধতার দায়িত্ব স্বীকার ক'রে তাকে এগিয়ে নিয়ে চলা (যা দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর বিকাশ ঘটাতে সক্ষম).....এখন সমস্যা হল এই কাজে তাদের সর্বাপেক্ষা বড় সাহায্যকারী হতে পারে ভারতীয় রেল। যা গোটা দেশকে একসূত্রে বেঁধে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। তাহলে কী কারণে সেই রেলের বেসরকারিকরণের আশু প্রয়োজন হয়ে পড়ল?

ভারতীয় রেল তার জন্মলগ্ন থেকেই সম্পূর্ণ সরকারি অর্থাৎ পরিকাঠামো থেকে পরিচালনা পুরোটাই রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এটা হওয়ার কারণ ভাবতে বসলে দুটো জিনিস সবার আগে মানতে হবে—এক, আমাদের সুবিশাল দেশের প্রতিটি অংশের মধ্যে যাত্রী ও পণ্যপরিবহণের মাধ্যমে সুলভ যোগাযোগ ব্যাবস্থা তৈরি করার জন্য রেলের চাইতে ভালো কোনও বিকল্প সরকারের হাতে ছিল না (মনে রাখতে হবে দেশের দরিদ্রতম প্রান্তিক মানুষটিও এই পরিসেবার সুবিধা গ্রহণে সক্ষম হতে পেরেছেন) আর দুই, গোটা দেশ জুড়ে এত বড় পরিকাঠামো (যাতে বিনিয়োগের উপর ফেরতযোগ্য লাভ কতটা হবে বা আদৌ হবে কিনা সন্দেহ) নির্মাণের জন্য লগ্নির যোগ্য পুঁজির যোগান সরকার ছাড়া আর কারও হাতেই থাকা সম্ভব নয়। এখানে পুঁজির যোগান শব্দটি হয়তো অনেকেরই ভ্রূ কুঞ্চন-এর কারণ হতে পারে তাই সেই বিষয়টাও একটু পরিষ্কার করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। ব্যক্তিমালিকানাধীন বা বেসরকারি প্রকল্পে লগ্নিযোগ্য পুঁজির ধারণায় কেবলমাত্র লগ্নিযোগ্য আর্থিক পুঁজিকেই নির্দেশ করা হয় কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই আর্থিক পুঁজি ছাড়াও আরও যা পুঁজি থাকে তার অন্যতম একটি উপাদান হলো মানবসম্পদ। .আমি একথা বলছি না যে ব্যক্তি মালিকানাধীন বেসরকারি উদ্যোগে মানবসম্পদের ব্যাবহার হয় না। কিন্তু সেই ব্যাবহৃত মানবসম্পদকে বেসরকারী ক্ষেত্র ব্যবহার করতে পারে তার লগ্নি যোগ্য আর্থিক পুঁজির বিনিময়ে ক্রীত শ্রম হিসেবে যেখানে রাষ্ট্র তার মানব সম্পদকে বিকাশের কাজে ব্যবহারের কাঁচামাল হিসেবে বিনিয়োগ করতে পারে। সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একটি অতিরিক্ত দায়বদ্ধতা থাকে আর তা হল মানবসম্পদের সর্বোচ্চ কল্যাণকামীতা। এই কারণেই বেসরকারি ক্ষেত্রের মতো কেবলমাত্র প্রদেয় শ্রমের একক ভিত্তিক বিনিময় মূল্য প্রদান করেই রাষ্ট্র থেমে থাকতে পারে না। তাকে তার শ্রমদানকারী শ্রমিকের পারিবারিক ও সামাজিক সুরক্ষার ব্যাবস্থাও করতে হয়।তাই বেসরকারি ক্ষেত্রে শ্রমকে কিনে ব্যবহার করা হয় যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এই শ্রমকে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করতে হয়।

(চলবে)

সদস্যদের অনুরোধঃ খেয়া পড়ুন। খেয়ায় লেখা পাঠান।

শতবর্ষে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (১৯২০ – ২০২০)

সুকমল ঘোষ

সাদা গোটানো সার্ট আর সাদা ধুতি পরা এক দীর্ঘকায় মানুষ, দীর্ঘ চার দশকের বেশি সময় ধরে সংগীতের মাধ্যমে আমাদের যে অনাবিল আনন্দ, নির্মল আনন্দ প্রদান করেছেন তার জন্য তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

হেমন্ত কণ্ঠটিকে অনেকে 'স্বর্ণকণ্ঠ' বলেন। সলিল চৌধুরী বলতেন 'ঈশ্বরের কণ্ঠ'। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান শুনে লতা মঙ্গেশকরের মনে হত – কোনও সাধু মন্দিরে বসে প্রার্থনা সংগীত গাইছেন।

বাহুল্য বর্জিত সাজ পোশাকের মতো হেমন্তের মনটি ছিল সরল, সাদা, অনেকটা শরৎকালের শুভ্র মেঘের মতো। অহংকারের কালো মেঘ সেখানে কখনও লেগে থাকত না।

কয়েকটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা পাঠকবর্গের কাছে পরিষ্কার হবে। একবার গজল সম্রাট মেহেদি হাসান হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। হেমন্ত মধ্যাহ্নভোজন স্থগিত রেখে গজল সম্রাটের জন্য অপেক্ষা করছেন। এক সময় সহধর্মিনী বেলা মুখোপাধ্যায়কে বলে বসলেন , " না, না, উনি কি আমার মতো মানুষের সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারেন? "

বেলা তখন বলেছিলেন, " উনি যেমন নিজের ক্ষেত্রে সম্রাট তেমনি তুমিও তো নিজের ক্ষেত্রে কম নয়, এক সম্রাট আরেক সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে আসতেই পারেন" ।

এটা কোনো অত্যুক্তি নয়।

এবার একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। এখন যেখান থেকে বিজন সেতু শুরু হয়েছে তার পাশে ছিল একডালিয়া পার্ক। একবার এই পার্কে বালিগঞ্জ মিউজিক কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছিল। তখন আমি ক্লাস সিক্সের ছাত্র, গেটের মুখে দাঁড়িয়েছিলাম। দেখলাম হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গুনগুন করে একটা রবীন্দ্রসংগীতের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ঢুকছেন। এই অনুষ্ঠানেই হেমন্ত যখন গাইছিলেন সেই গানের ফাঁকে একজন শ্রোতা কোনও একটা গানের অনুরোধ করলেন, হেমন্ত অনুরোধটা শুনতে পাননি তাই বিনত ভাবে মাথা নামিয়ে বললেন, "আজ্ঞে কী বললেন"? তাঁর এই বিনত ভঙ্গিমাটি সেদিন আমার খুব ভাল লেগেছিল।

আসলে এক শ্রেণির পরিশীলিত রুচির যথার্থ প্রতিভাবান মানুষেরা আমাদের সাংস্কৃতিক আঙিনায় চিরকালই ছিলেন যাঁরা নিজের সম্পর্কে বিনয় প্রকাশকে ভদ্রতার অঙ্গ বলেই মনে করতেন যেমন একবার অন্তিম লগ্নে এসে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মনে হয়েছিল যে তিনি ব্যাক ডেটেড হয়ে গেছেন কিন্তু আজ বেঁচে থাকলে দেখতে পেতেন এই নেট শাসিত,

পপ, রক শাসিত জন্ম জন্মান্তরেও তিনি সমান ভাবে উজ্জ্বল। এখনও তাঁর 'কোনও এক গাঁয়ের বধূ', 'রানার', 'অবাক পৃথিবী' বা 'নাগিন' কিংবা 'নীল আকাশের নীচে' ছবির গান শ্রোতারা আগ্রহ নিয়ে শোনেন।

আর রবীন্দ্রনাথের গান। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষের মধ্যে কবির গানকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে যে দু জন গায়কের অবদান সবচেয়ে বেশি তাঁরা হলেন পঙ্কজ কুমার মল্লিক ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

সংগীত জীবনের সূচনায়, তরুণ বয়সে তিনি পঙ্কজ মল্লিকের গায়কিকে হুবহু অনুসরণ করতেন। প্রথম যে বার আকাশবাণীতে তাঁর সঙ্গে পঙ্কজ মল্লিকের মুখোমুখি দেখা হয়েছিল সে সময় পঙ্কজ মল্লিক নাকি বলেছিলেন, "তুমি যে দেখছি আমাদের ভাত মারবে হে" । যাই হোক কঠোর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তিনি এই অনুকরণপ্রিয়তাকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

আজ বঙ্গোপসাগর থেকে আরবসাগরের তীরে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর অসংখ্য অনুরাগী। কিন্তু বাঙালির একটা স্বভাবদোষ আছে তা হল অতি সাধারণ বাঙালি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেক সর্ব বিষয়ে পারদর্শী ভাবেন। তাই সংগীত, সাহিত্য, চলচ্চিত্র, খেলাধূলা সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মতো মতামত দিয়ে বসেন।

কবীর সুমনের ভাষায় "এই হল পশ্চাৎপক্ক বাঙালি" । আমায় যেমন একবার এক চলচ্চিত্র এডিটর বলেছিলেন যে হেমন্তবাবু তো সারাজীবন বেসুরো গেয়েই কাটিয়ে দিলেন। আমি একটা কাজে ওখানে বসেছিলাম নয়তো একটা থাপ্পড় মেরে তাঁর জীবনবোধটাই পালটে দিতাম। সেটা আমি সেদিন করিনি বলেই আজ এই বুড়ো বয়সে এখনও আমার কষ্ট হয়। এক শ্রেণির বাঙালি ধরে নিলেন হেমন্তবাবুর গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গানগুলো ঠিক রবীন্দ্রসংগীত নয় যেন।

এটা খুব আশচর্যের যে এই তথাকথিত রবীন্দ্রানুরাগীদের জগতে হেমন্তবাবু রবীন্দ্রসংগীতের গায়ক হিসাবে চিরকাল ব্রাত্যই থেকে গেলেন। অথচ পঙ্কজ কুমার মল্লিক, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় না থাকলে সাধারণ মানুষ রবীন্দ্রসংগীত শুনতই না। ঘরে ঘরে রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দিয়েছেন এই দু জনই।

গান বাজনা হেমন্তবাবুর লক্ষ্য ছিল না, ছিল নিয়তি। যৌবনে স্বপ্ন ছিল সাহিত্যিক হওয়ার। পরবর্তী কালে দিকপাল সংগীত শিল্পী হয়েছেন এমন অনেকেরই প্রাথমিক পর্বে অন্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার উদ্যোগ ছিল। কেউ হতে চেয়েছিলেন খেলোয়াড় কেউ বা নিশ্চিত সংসারী জীবন কাটাতে চেয়েছিলেন।

(চলবে)

ছায়া • Vol 09 • Issue 07-08 • 15 August 2020 RNI No. WBBEN/2010/32438 Regd.No.:KOL RMS/426/2020

ফ্রেম – Rule of Third

মেগাপিক্সেল যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে চলুন কোথাও ঘুরে আসি। আরে আরে ক্যামেরা নিলেন না যে!

"দাদা আমার কাছে আপেল আছে, চিন্তা নেই।"

"তাহলে আমাদের কী হবে, এই ফোনে কি ভাল ছবি হবে না?"

আমার মতে এটাও একটা ভুল ধারণা (myth)। হ্যাঁ, ছবি তুলতে ক্যামেরা লাগে কিন্তু আমরা সাধারণত যেরকম ছবি তুলি তাতে একটা সাধারণ ক্যামেরাই যথেষ্ট। আর একটু সচেতন ভাবে ছবি তুললেই আমাদের ওই সাধারণ ক্যামেরার ছবি মনোগ্রাহী হয়ে উঠতে বাধ্য।

ছবিতে আলোর ভূমিকা যেমন অনস্বীকার্য সেরকম ছবির বিষয় ও স্থান (subject and place) খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর যেটা জরুরি সেটা হল 'ফ্রেম' (framing)। মানে ছবির বিষয়কে কী ভাবে আমরা ফ্রেমবন্দি করছি।

এই ব্যাপারে একটাই পদ্ধতি আছে – "Rule of Third"। সেটা কী এবার দেখা যাক।

ক্যামেরার মধ্যে দিয়ে যে আয়তকার অংশ দেখা যায় তাকে বলে "ফ্রেম"।

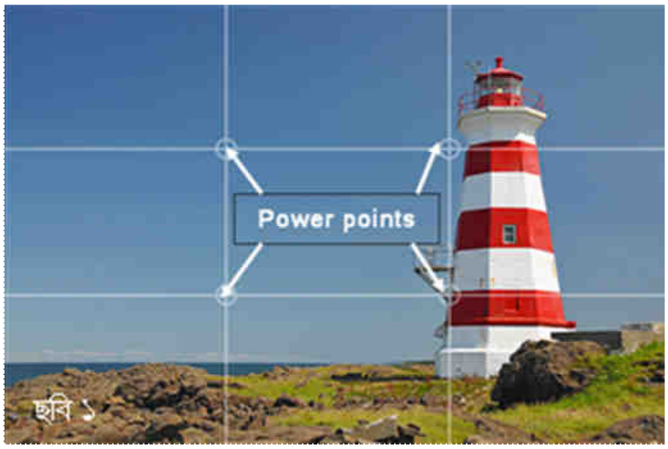

ছবি ১

সেই ফ্রেমকে মনে মনে সমান্তরাল (horizontal) আর উল্লম্ব (vertical) রেখা টেনে ৯ ভাগে ভাগ করো (ছবি ১-র মতন)। ওই রেখাগুলো যেখানে নিজেদের ছেদ (intersect) করছে তাদের কে বলে "power points"। বাংলাতে একে শক্তিশালী বিন্দু বলতে পারো। তাই এখানে যাকে রাখবে সে শক্তিশালী হবে। ছবি তোলার সময় আমদের একটু খেয়াল করে বিষয়বস্তুকে এই চারটে শক্তিশালী বিন্দুর কাছাকাছি রাখতে হবে, ব্যস। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা একদম সোজা হয়ে যাবে।

বাঁদিকের ছবিতে (ছবি ২) পাথরের স্তম্ভ একদম মাঝে আছে, আর ডানদিকের ছবিতে আছে একটা শক্তিশালী বিন্দুর কাছে। এই

ছবি ২

সামান্য স্থান পরিবর্তনে আপাত সামান্য ছবি একটা অন্য মাত্রা পেয়েছে। আরেকটা ছবি দেখি। ছবি ৩-এ শুকনো গাছ এই সুন্দর পরিবেশকে আরও মনোরম করেছে – সেই শক্তিশালী বিন্দুর কাছে থেকে। গাছটা যদি ফ্রেম-এর ঠিক মাঝখানে থাকতো তাহলে পুরো দৃশ্যটা মাঠেই মারা যেত – তাই না?

ছবি ৩

এইসব দেখে নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে – "দাদা মানুষের মুখের (portrait) ছবি তোলার সময় এই "rule of third" খাটবে কী করে? আমার প্রিয়জনকে কি ওই বাঁদিকে বা ডানদিকে ঠেলে দেব?"

খুব প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। উত্তর কিন্তু একটাই – "rule of third"। কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে এটার ব্যতিক্রম হয়, সেটা আবার অন্যদিন আলোচনা করব। মিষ্টি হাসিমুখ কিন্তু সেই একটা শক্তিশালী বিন্দুর (power point) আশেপাশে রয়েছে।

ছবি ৪

এবার একটু সমান্তরাল (horizontal) "rule of third" দেখি। যেটা প্রাকিতিক দৃশ্য (landscape photography) তোলার জন্য খুব জরুরি। ছবি ৫-এ দিগন্ত (horizon) আর সূর্য আছে নীচের লাইনের কাছে, মাঝখানে নয়। আরেকটা কথা মাথায় রাখতে হবে, আমাদের চোখ যেন ছবির সব কিছু দেখতে পায়, মাঝে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকলে সেটার ব্যাঘাত ঘটতে বাধ্য। আর সেটা করতে সাহায্য করে "rule of third"।

এবার থেকে এইটুকু মাথায় রেখে ছবি তুললে, আপেল আঙ্গুর-র তফাত কিন্তু বিশেষ থাকবে না। যেটা থাকবে সেটা হল একটা সুন্দর স্মৃতি।

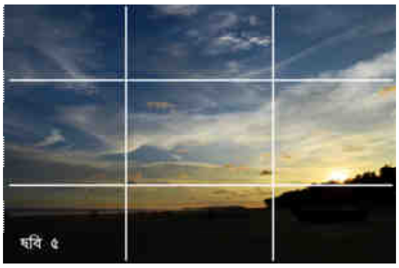
ছবি ৫

পুনশ্চঃ - যদি মনে হয় সব ছবি কি এই "rule of third" মেনে হয়? না ব্যতিক্রম আছে, আর ব্যতিক্রম নিয়মকেই প্রতিষ্ঠা করে – exception proves the rule। সেই ব্যতিক্রম (exception) নিয়ে আরেকদিন আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

দেবদীপ দে

উন্নতমানের খাতা পাইকারি দামে বাড়ি পৌঁছে দেব।
যোগাযোগ ঃ দেবাশিস দে 9674511458

Modicare এর বিরাট সম্ভার ও বিবিধ অফার থেকে বেছে নিন আপনার পছন্দের সামগ্রী,
যোগাযোগ-সাগর বাগচী, 8240733254

One stop solution for all computer related problems contact **PIXEL PERFECT 9830805688**.
We also deal in new PC, Laptops and parts

লাঞ্চ ও ডিনার ঘরে বসে ইচ্ছেমতো সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যসম্মত ও ঘরোয়া খাবার খান।
যোগাযোগ – ইন্দ্রনীল সরকাব **9830882256**

মোবাইলে বা কমপিউটারে খুলুন

kheya.org

আমাদের ডিজিটাল খেয়া পড়ুন ও লেখা পাঠান।
সাহিত্য, প্রতিবেদন, ফিচার, লাইফস্টাইল, খেলা ইত্যাদি নানান বিভাগে লেখা এবং ছবি (১২০০পিক্সেলের মধ্যে) পাঠান।

সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত ’৬৬

গ্রন্থালোক
সংগ্রহ করুন
রবীন্দ্র নাট্য সমীক্ষা ঃ কনক বন্দ্যোপাধ্যায়
রচনা বিচিত্রা ঃ অধ্যাপক সৌমেন্দ্রকুমার বাগচী
যোগাযোগ- 8240733254

উপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতা - ৬

বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ে শিক্ষার সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা

বিষয় -

শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসচেতনতা ও স্বাস্থ্যবিধি

বক্তা - ডা. উষ্ণীক সেন

ওয়েব লেকচার

আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর রবিবার
সন্ধে ৬.৪৫ মিনিট থেকে
প্ল্যাটফর্মঃ Zoom
২০২০

বক্তা পরিচিতি

ডাঃ উষ্ণীক সেন

সার্ভেলেন্স মেডিক্যাল অফিসার (এস.এম.ও) – হাওড়া জেলার ভারপ্রাপ্ত ন্যাশনাল পাবলিক হেলথ সার্ভেলেন্স প্রোজেক্ট (এন.পি.এস.পি), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।
বর্তমানে হাওড়া জেলার কোভিড ১৯-এর নোডাল রেফারেন্স পয়েন্ট
গত দুই দশকের উপর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জাতীয় পোলিও নির্মূলকরণ প্রোগ্র্যামের কাজে প্ল্যানিং, ট্রেনিং ও মনিটারিং কাজের সঙ্গে যুক্ত।
ভারতে পোলিও দূরীকরণ হওয়ার পর হাম ও রুবেলা দূরীকরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত।
টীকা দ্বারা প্রতিহত রোগের অর্থাৎ ভ্যাকসিন প্রিভেন্টেবল ডিজিজ (ভি.পি.ডি) এর সার্ভেলেন্সে অভিজ্ঞ।
বক্তা ডাঃ সেন পাবলিক হেলথ বিশেষজ্ঞ ও এপিডেমিওলজিস্ট।

খেয়া • Vol 09 • Issue 07-08 • 15 Aug 2020 • RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2020

মহেন্দ্র লাল দত্ত®
mld®
MOHENDRA LAL DUTT
A TRADITION OF TRUST
SINCE: 1882
47/3B, GARIAHAT ROAD,
KOLKATA-700019
Phone: 033 24631168
(M) 9830174960 / 9903731550
website: www.mldumbrella.com

Best Compliments from:

SUDEEP SAHA

Madhyamik 1983

'খেয়া' পত্রিকার সাফল্য কামনায়
ব্যাচ ১৯৫২
জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন

যার খাবার খেলেই মন ভালো হয়ে যায়

গুণ ক্যাটারার

৪২/৪৩ ইষ্ট প্রণ্ড পার্ক, কলকাতা – ৩৯

০৩৩ ২৩৪৩ ৯৬৮৮

৯৮৩১০০১১০৯ / ৭০০৩৬৬৮৯৬৩

EXPRESS COURIER SERVICES
happily announces
Pick up & Drop at your Door Step
with all
Documents, Materials
& All other Accessories

PH-2 Plot No. 86
Kasba Industrial Estate
Kolkata - 700 107
West Bengal, India
Call: 9836311020 / 9748664539
Email: express.cs07@gmail.com

SATYAM UNI MART
Happily announces
Service at "YOUR DOORSTEP" with all Electrical Equipments & Accessories

Printer & Publisher: **SANDIP CHATTERJEE** (M.: 8981752100)
On behalf of **BALLYGUNGE JAGADBANDHU INSTITUTION ALUMNI ASSOCIATION**
Printed at 189F/2, Kasba Road, Kolkata - 700 042
Published from: Print Gallery, 25, Fern Road, Kolkata - 700 019
Editor's Name: **SANTANU CHATTERJEE**